ভূমিকা :

লেখক পরিচিতি : প্রথম আবির্ভাবেই সকলকে সচকিত, সম্মোহিত করে বাঙ্‌লা উপন্যাস সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। তখন রবীন্দ্রনাথ-প্রভাতকুমারের গল্প-উপন্যাস বাঙ্‌লার পাঠকচিত্তকে মোটামুটি আবিষ্ট রেখেছে; তখন কেউ ভাবতে পারে নি যে ১৯০৩-এর কুন্তলীন-পুরস্কার বিজয়ী 'মন্দির' গল্পের অখ্যাত লেখক পরবর্ত্তীকালে রবীন্দ্র-কিরণ ও প্রভাত-রশ্মিকে আচ্ছন্ন করে বাঙালী পাঠকের প্রাণে শরৎ পূর্ণিমার চন্দ্রালোক ছড়িয়ে দেবে। ১৯০৭-এ 'ভারতী' পত্রিকায় লেখকের নাম ছাড়া 'বড়দিদি' যখন প্রকাশিত হয় তখন বঙ্গদর্শন-সম্পাদক শৈলেশ মজুমদার ও সমগ্র পাঠকসমাজ মুগ্ধ-মনে সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই 'বড়দিদি'র লেখক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন জানালেন যে তিনি 'বড়দিদি'র লেখক নন তখন সত্য আবিষ্কৃত হলো। এইভাবে বাঙ্‌লা গল্প-উপন্যাসের পাঠকসমাজকে সচকিত-সম্মোহিত ক'রে আবির্ভূত হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি নিজেই এক সময় বলেছেন—'In Bengal, I am the only writer who has not had to struggle.'

এত সহজে যে শরৎচন্দ্র পাঠক-মন জয় করতে পেরেছিলেন তার কারণ তিনি যে বাস্তবজীবনে ছবি এঁকেছেন তার সঙ্গে একটা সূক্ষ্ম রোমান্সের বিস্ময়বোধ বিজড়িত ছিল। প্রতিদিনের সঙ্গে দিনাতীতের, প্রত্যক্ষের সঙ্গে পরোক্ষের, বাস্তবের সঙ্গে রোমান্সের বিস্ময়কর মিল ঘটাতে পেরেছিলেন ব'লেই তাঁর লেখা সাধারণ মানুষের জীবনের সাধারণ কাহিনী পাঠকের মন প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছে। পাঠক এইসব রচনায় নিজের মনের আয়নায় যেন নিজের জীবনেরই প্রতিচ্ছবি দেখেছে।

বাঙ্‌লাদেশের সমাজ ও সমাজপতিদের হৃদয়হীনতা, তাদের পীড়নে-পেষণে দলিত অসহায় নরনারীর বিচিত্র বেদনাকে সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করেছেন শরৎচন্দ্র। যারা উপেক্ষিত-অবহেলিত, যারা নিন্দিত-ভর্ৎসিত—সকলেরই মধ্যে মনুষ্যত্বের মহিমা সন্ধান করেছিলেন তিনি। সহজ ভাষায় সহজ প্রাণের সকরুণ ব্যথাকে রূপ দিয়েছিলেন তিনি। সমাজের পীড়নে ক্লিষ্ট নরনারীর হৃদয়বেদনাকে পাঠকের অনুভূতির সামগ্রী করতে চেয়েছিলেন শরৎচন্দ্র।

হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর শরৎচন্দ্রের জন্ম হয়। তিনি পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান। প্রথম সন্তান অনিলাদেবী শরৎচন্দ্রের দিদি। পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায়, মাতা ভুবনমোহিনী দেবী। হালিশহরের রামধন গঙ্গোপাধ্যায় সরকারী কর্মোপলক্ষে ভাগলপুরে ছিলেন এবং সেখানেই স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের মাতামহ, ভুবনমোহিনীর পিতা। রামধন গঙ্গোপাধ্যায়ের পাঁচপুত্র পরবর্ত্তীকালে ভাগলপুরে সম্পন্ন যৌথ পরিবারে অন্তর্ভূত থাকতেন। সেখানেই (মাতুলালয়ে) শরৎচন্দ্রের বাল্য ও কৈশোরের অধিকাংশ ভাগ কেটেছে। শরৎচন্দ্রের জীবনে ও সাহিত্যে এই ভাগলপুরের প্রভাব অতিশয় ব্যাপক। শরৎচন্দ্রের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের অনেকদিন ভাগলপুরের এই যৌথ পরিবারে কেটেছে ব'লেই বোধকরি বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের যৌথ-জীবনযাত্রার সরস, প্রত্যক্ষ ও বর্ণবহুল চিত্রাঙ্কনে তিনি বাঙ্‌লা সাহিত্যে অদ্বিতীয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পেরেছেন।

Scanned with CamScanner

জীবন ও সাহিত্য : শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অস্থিরচিত্ত ভবঘুরে ধরণের মানুষ। তাঁর ছিল সাহিত্যরচনার নেশা। অস্থিরচিত্ততার জন্য তিনি কখনও কোন চাকুরীতে টিকে থাকতে পারেননি, এবং অনেক কিছু লিখলেও কোন কিছু সম্পূর্ণ করতে পারেননি। তিনি শ্বশুরবাড়িতে থেকে স্কুলের পাঠ শেষ করেন, কলেজে ভর্তি হয়ে পড়া শেষ না ক'রে দেবানন্দপুরে ফিরে যান, আবার ভাগলপুরে ফিরে আসেন। একবার ডিহরিতে কিছুদিনের জন্য চাকুরী করেন। কোথাও তিনি পাকাপাকিভাবে থাকেননি।

উত্তরাধিকার : শরৎচন্দ্র লিখেছেন—'From my father I inherited nothing, except, as I believe his restless spirit his keen interest in literature.' মতিলালের এই দুইটি চরিত্র-বৈশিষ্ট্য—অস্থিরচিত্ততার ফলে ভবঘুরে স্বভাব ও সাহিত্যানুরাগ—পুত্র শরৎচন্দ্রের মধ্যে কিছুটা সংক্রমিত হয়েছিলো। শরৎচন্দ্র অল্প বয়সে ভবঘুরে হ'য়ে বহুদেশ ঘুরে এসেছিলেন এবং সারাজীবন স্বপ্নবিভোর হয়ে কাটিয়েছেন। ভাগলপুর-রেঙ্গুন-কলকাতায় যেমন তার জীবন ও কর্ম প্রসারিত হয়েছে, তেমনি সাহিত্যসৃষ্টি থেকে স্বদেশী আন্দোলন পর্যন্ত তাঁর আত্মনিয়োগের ক্ষেত্র বিস্তৃতি লাভ করেছে।

শরৎচন্দ্রের জন্মের পর মতিলাল বেশ কিছুদিন দেবানন্দপুরে বসবাস করেন। সেখানেই পাঁচ বছর বয়সের শরৎচন্দ্রকে তিনি 'প্যারীপণ্ডিতের পাঠশালায়' ভর্তি ক'রে দেন। এই পাঠশালায় পড়ার সময়ে কোনও বালিকার গাঁথা বৈঁচিফুলের মালা শরৎচন্দ্র লাভ করছেন কিনা তা যদিও জানা যায় না, তবে, এইটুকু জানা গেছে যে তিনি পণ্ডিতমশায়ের উপর দৌরাত্ম্য ক'রে সেখান থেকে পলায়ন করেছিলেন। ইন্দ্রনাথের কাহিনীতে তারই প্রতিফলন পাওয়া যায়।

মতিলাল কখনও ভাগলপুর ছেড়ে দেবানন্দপুরে আবার দেবানন্দপুর ছেড়ে ভাগলপুরে এসে বসবাস করতেন। অবশেষে দেবানন্দপুরের বাস উঠিয়ে স্থায়িভাবে ভাগলপুরে এসে গেলেন। অল্পদিন ডিহরীতে চাকুরী উপলক্ষে ছিলেন এবং স্ত্রীর মৃত্যুর পর ভাগলপুরের শ্বশুরালয় ছেড়ে ভাগলপুরেরই সন্নিকটে খঞ্জরপুরে ভাড়া বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। এই খঞ্জরপুরে বাসকালে নিদারুণ অর্থসংকট দেখা দেওয়ায় শরৎচন্দ্র এফ-এ পরীক্ষার ফী দিতে না পেরে বনেলী এস্টেটে চাকুরী গ্রহণ করেন। কিন্তু, পিতার মতই অল্পদিনে সে কাজ ছেড়ে দিয়ে ভাগলপুরে ফিরে আসেন। খঞ্জরপুরের এই ভাড়া বাড়িতে থাকাকালে মতিলাল এবং শরৎচন্দ্র আর্থিক দিক দিয়ে চরম দুর্গতির মধ্যে পড়েন। এক সময়ে শরৎচন্দ্র সন্ন্যাসীর বেশে গৃহত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হন। সন্ন্যাসীর বেশেই তিনি মজঃফরপুরে অনুরূপা দেবীর গৃহে উপস্থিত হন। মজঃফরপুরে তিনি মহাদেব শাহু নামে এক জমিদার-তনয়ের সান্নিধ্যে আসেন এবং তার আশ্রয়ে কিছু দিন ছিলেন। সেখানে থাকাকালেই তিনি পিতা মতিলালের মৃত্যুসংবাদ পান। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র ভাগলপুরকে পিছনে ফেলে ক'লকাতায় এসে উপস্থিত হন। শরৎচন্দ্রের এই ভাগলপুর জীবন শ্রীকান্ত ১ম পর্বে অনেকাংশে প্রতিফলিত হয়েছে।

শরৎচন্দ্র ও শ্রীকান্ত : ভাগলপুরের বাঙ্গালীটোলায় গাঙ্গুলীদের যৌথ পরিবারে মা ভুবনমোহিনী ও বাবা মতিলালের সঙ্গে শরৎচন্দ্র বাল্যজীবন কাটিয়েছেন। শ্রীকান্ত-১ম

পর্বের পিসিমা ও পিসেমশাইকে ভুবনমোহিনী ও মতিলালের মধ্যে সহজেই সন্ধান করা যায়। মেজদাদার নেতৃত্বে পড়াশোনায় যে চিত্র বর্ণিত আছে তাকে সহজেই গাঙ্গুলীদের বৈঠকখানায় খুঁজে নেওয়া যেতে পারে। কুমার সাহেবের তাঁবুকে মজঃফরপুরের জমিদার-তণয় মহাদের শাহুর তাঁবু ভেবে নিতেও কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। খঞ্জরপুর থেকে সন্ন্যাসীবেশে নিরুদ্দেশ হ'য়ে যাওয়া শরৎচন্দ্র যথার্থই শ্রীকান্তর মত গাঁজার উপকরণ ও দুই চেলা পরিবৃত 'গুরুজী'র শিষ্যত্ব সাময়িকভাবে নিয়েছিলেন কিনা তা অনুমানসাপেক্ষ। শ্রীকান্ত ১ম পর্বে যে দুঃসাহসী বালক রাতের অন্ধকারে গোঁসাইবাগানের সর্পসঙ্কুল ভয়াবহ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বাঁশি বাজিয়ে চলে আসতো কিংবা প্রহরারত জেলেদের ফাঁকি দিয়ে দুরন্তস্রোত তুচ্ছ করে নৌকা চালিয়ে মাছ চুরি ক'রে আনতো তার মধ্যে শরৎচন্দ্রের নিজের বাল্যজীবনের প্রতিবিম্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। এ বিষয়ে মনীষী সমালোচক জানাচ্ছেন—"গ্রামে তিনি নৌকা চালাইয়া মাছ ধরিয়া সময় কাটাইতেন। ভাগলপুরে আসিয়া তিনি নানা খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করিতেন, নদীতে সাঁতার কাটিতেন, সাপ ধরিতে চেষ্টা করিতেন এবং গভীর রাত্রিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার না ছিল সাপের ভয়, না ছিল ভূতের ভয়।" শরৎচন্দ্র তাঁর এই বাল্যজীবনের ছবি মনে মনে অনুধ্যান ক'রেই কি 'মহাপ্রাণ' ইন্দ্রনাথকে সৃষ্টি করেছিলেন?

মাটি থেকে রস আহরণ করে গাছ, কিন্তু ফুলটি যখন সে ফোটায় তখন আর মাটিতে নয়, আকাশে। বাস্তবের মাটি থেকে রস আহরণ ক'রে কবির মনোতরু ফুলটি ফোটান কল্পনার আকাশে। সাহিত্যিক তাঁর সৃষ্টির উপাদান সংগ্রহ করেন বাস্তবজীবন থেকে; কিন্তু, সাহিত্য বাস্তবের হুবহু প্রতিচ্ছবি নয়। বস্তু জগতের অভিজ্ঞতা লেখকের কল্পনার যোগে নূতন রূপে মণ্ডিত হ'য়ে সাহিত্যে রূপলাভ করে। ব্যক্তি শরৎচন্দ্রের অভিজ্ঞতা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের মানসকল্পনার রসে জারিত হয়ে নূতন মূর্তি পরিগ্রহ করেছে শ্রীকান্ত ১ম পর্বে।

শ্রীকান্ত ১ম পর্বের পর্যালোচনা : ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ থেকে, ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৩ মাস ধ'রে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'শ্রীশ্রীকান্ত শর্মা' নামে এক লেখকের 'শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী' প্রকাশিত হতে থাকে। প্রথম দুইটি সংখ্যার পরেই লেখকের নাম দেখা যায় শ্রীকান্ত শর্মার পরিবর্তে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৯১৭-র ১২ই ফেব্রুয়ারী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'শ্রীকান্ত ১ম পর্ব' পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। বলাবাহুল্য, গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে 'ভ্রমণ কাহিনী' শব্দটি বর্জিত হয়। এর মধ্য দিয়ে লেখকের দুইটি অভীপ্সা প্রকটিত হয়। এক, লেখক এই রচনাটিকে 'ভ্রমণ কাহিনী' হিসাবে গণ্য করতে চাননি। দ্বিতীয়, তিনি শ্রীকান্তকেই এই কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র বা নায়ক রূপে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন। যদিও গ্রন্থের শুরুতেই শ্রীকান্ত তার 'ভবঘুরে' জীবনের বৃত্তান্ত বলতে শুরু করেছেন এবং গ্রন্থ মধ্যে 'ভারতবর্ষের' পাঠক-পাঠিকার উল্লেখ থেকে গেছে। এককথায়, 'শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী'-রই পরিমার্জিত রূপ 'শ্রীকান্ত' ১ম পর্ব।

কাহিনী বিন্যাস : শ্রীকান্ত ১ম পর্বের কাহিনীকে দুইটি সুস্পষ্ট ভাগে ভাগ করা যায়। দ্বাদশটি পরিচ্ছেদে গ্রথিত এই শ্রীকান্ত-কথার প্রথম সাতটি অধ্যায় নিয়ে একটি ভাগ ও

Scanned with CamScanner

শেষ পাঁচটি অধ্যায় নিয়ে আরেকটি ভাগ। প্রথমভাগে শ্রীকান্তর বাল্য ও কৈশোরের কাহিনী, দ্বিতীয়ভাগে যৌবনের দিনে বিচিত্র প্রণয়সঞ্চারের বৃত্তান্ত।

কাহিনীর সূত্রপাত ফুটবল খেলার মাঠে। দুইদলের প্রচণ্ড মারামারির মধ্যে পড়ে গোবেচারা শ্রীকান্ত যখন দিশাহারা তখনই বিপদ্-তারণ রূপে অচেনা ইন্দ্রনাথের আর্বিভাব। তার আজানুলম্বিত বাহুর শক্তিতে শ্রীকান্তর বিপদমুক্তি। ইন্দ্রনাথের পকেটে শুক্নো সিদ্ধিপাতা ও তার অকুতোভয় ধূমপান শ্রীকান্তকে বিস্ময়ে বিহ্বল করে। মনে মনে ইন্দ্রনাথের জন্য শ্রীকান্তর বিচিত্র আকর্ষণবোধ জাগে। মেজদাদার কৌতুককর শাসনে সন্ত্রস্ত ছোট ভাইদের পাঠাভ্যাস, অকস্মাৎ 'হুম্' শব্দে ব্যাঘ্ররূপী বহুরূপীর আবির্ভাবে মেজদাদার চৈতন্যলোপ, সারা বাড়ির সকলে ভয়ে সন্ত্রস্ত, পিসেমশাইদের 'সড়কি লাও', 'বন্দুক লাও' চিৎকার,—ওদিকে গোঁসাইবাগানের সর্পসঙ্কুল জঙ্গলের পথ বেয়ে বাঁশি বাজিয়ে ইন্দ্রনাথের আগমন। চেঁচামেচি শুনে সকলের সাবধান-বাক্য উপেক্ষা করে অকুস্থলে তার আবির্ভাব এবং বিনা দ্বিধায় প্রাঙ্গনের ডালিমগাছের তলায় লুকিয়ে থাকা শ্রীনাথ বহুরূপীর উদ্ধার। দুঃসাহসী নির্ভীক ইন্দ্রনাথের মোহময় আহ্বানে সাড়া, রাতের অন্ধকারে প্রবল স্রোতোধারা উপেক্ষা ক'রে ইন্দ্রের সাহচর্যে জেলেদের মাছ চুরি করা, সেই মাছ বিক্রয় করা, ফেরার পথে শ্মশান ঘাটের সিঁড়ির কাছে সাত-আট বছরের শিশুর মৃতদেহের প্রতি ইন্দ্রনাথের মমত্ব, শ্রীকান্তর গৃহে প্রত্যাবর্তনে মেজদার শাসনের উদ্যোগ পিসিমার হস্তক্ষেপে প্রতিহত ও বাড়ির অন্যান্য বালকদের মেজদার অধিকার-চ্যুতিতে উল্লাস। আট-দশ দিন পরে ইন্দ্রের পুনরাবির্ভাব, দিদির কাছে যাওয়ার জন্য শ্রীকান্তর সম্মতি-আদায়, নৌকাযোগে ঘন বনাচ্ছাদিত সাপুড়ের ঝুপড়িতে আসা, নেশাচ্ছন্ন শাহজীর প্রসন্নতার প্রত্যাশায় ইন্দ্রর আকুতি, গোখরো সাপ নিয়ে ইন্দ্রর খেলার ব্যর্থ চেষ্টা, অন্নদাদিদির আবির্ভাবে শ্রীকান্তর মুগ্ধ বিস্ময়, মন্ত্র-তন্ত্র না-জানার স্বীকারোক্তি, ইন্দ্রের ক্ষোভ, শাহজীর প্রহারে অন্নদাদিদির আর্তনাদে ইন্দ্রনাথের উত্তেজনা ও শাহজীকে শাসন, পুলিশের নামোচ্চারণে শাহজীর নির্বাক হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুব্ধচিত্তে ইন্দ্রনাথের শ্রীকান্তকে নিয়ে স্থানত্যাগ। তিন-চার মাস পরে দত্তদের বাড়ির কালীপূজোয় নাটকাভিনয়ের কৌতুককর বর্ণনা। ইন্দ্রের আবির্ভাব ও শ্রীকান্তকে দিদির আহ্বানের কথা জ্ঞাপন, উভয়ের অন্নদাদিদির কুটিরে উপস্থিতি। সর্পদংশনে শাহজীর মৃত্যু, মৃতদেহে কবরস্থ করা। অন্নদাদিদির এই প্রথম স্বীকারোক্তি যে শাহজী তাঁর স্বামী ছিলেন। তিনদিন পরে শ্রীকান্তকে লেখা অন্নদাদিদির চিঠি—অন্নদাদিদিও হিন্দুর মেয়ে এবং শাহজীও হিন্দুই ছিলেন। বিধবা শ্যালিকাকে হত্যার পরে অন্তর্ধান করেছিলেন। মুসলমান হয়ে সাপুড়েরূপে দেখা দেওয়ায় অন্নদাদিদি স্বামীকে চিনতে পারেন এবং স্বামীর সঙ্গেই গৃহত্যাগ করেন। তিনি কুলটা নন, তিনি পতিব্রতা। তারপরেই শ্রীকান্তর জীবনে চিরস্থায়ী প্রভাব রেখে অন্নদাদিদির অন্তর্ধান। ইন্দ্রও কিছুদিন অন্তর্হিত। হঠাৎ একদিন আবার তার কাছ থেকে থিয়েটার দেখার আহ্বানে শ্রীকান্তর সাড়া দিতে হ'লো। ইন্দ্রর নতুনদা—দর্জিপাড়ার ছেলে—তার কৌতুককর কার্যকলাপ ও হীন আচরণের মধ্যদিয়ে শ্রীকান্তর জীবনে মানুষের হীনতার চিহ্ন রেখে গেল। এইখানেই কাহিনীর প্রথমার্ধের সমাপ্তি, নৌকাচড়ার সমাপ্তি, শ্রীকান্তর জীবনে ইন্দ্রনাথের সাহচর্যেরও সমাপ্তি। বাল্য ও কৈশোর অতিক্রান্ত হয়ে শ্রীকান্তর যুবাবয়সের সূত্রপাত।

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয়ার্ধে, অনেকদিন পরে, অন্নদাদিদির স্মৃতিটাও যখন শ্রীকান্তর চিত্তে ঝাপসা হয়ে গেছে তখন একদিন স্কুলের সহপাঠী এক রাজতনয় কুমার সাহেবের শিকার পার্টিতে আমন্ত্রণ এলো। সেখানে গিয়ে পাটনা থেকে আগতা বাইজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, নাম পিয়ারী বাইজী। প্রথম রাতে বাইজীর মনপ্রাণ দিয়ে গাওয়া গানে শ্রীকান্ত যখন মুগ্ধ তখনই এক অপ্রত্যাশিত আঘাত এলো বাইজীর কাছ থেকে—'আপনি এই পনেরো-যোল দিন ধ'রে এর মোসাহেবি করবেন। যান, কালকেই বাড়ি চলে যান।' তারপর বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। বাইজী আসলে বহুকাল আগে যার মৃত্যু হয়েছে বলে রটনা সেই রাজলক্ষ্মী। শৈশবে শ্রীকান্তর অনেক জুলুম নীরবে সহ্য করেছে, বৈঁচিফুলের মালা গেঁথে শ্রীকান্তকে উপহার দিয়েছে, সে বড় হবার পর বিরিঞ্চি দত্তের পাচক কুলীন ব্রাহ্মণ একসঙ্গে দুই বোন সুরলক্ষ্মী ও রাজলক্ষ্মীকে সত্তর টাকা পণে বিয়ে করে অন্তর্ধান হয়েছে। বছর দেড়েক পরে প্লীহাজ্বরে সুরলক্ষ্মীর মৃত্যু, রাজলক্ষ্মীর মায়ের সঙ্গে কাশীযাত্রা এবং সেখানে ওলাউঠায় মৃত্যুর সংবাদই শ্রীকান্তর জানা ছিল।

কুমার সাহেবের তাঁবুতে ভূতের গল্প, শ্রীকান্তর ভূতে অ-বিশ্বাস, শনিবারের অমাবস্যার রাতে শ্মশান-পরিক্রমার অঙ্গীকার এবং তা' জেনে পিয়ারী বাইজীর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, অনুনয়-অনুরোধ। শ্রীকান্তর শ্মশান গমনোদ্যোগের মুহূর্তে পিয়ারীর সকরুণ মিনতি। শ্মশানের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, নিরুদিদির স্মৃতি, রাত্রির শেষপ্রহরে শ্মশানভূমিতে শ্রীকান্তর সন্ধানে পিয়ারীর ভৃত্য রতনের সদলবলে আবির্ভাব শ্রীকান্তর জন্য বাইজীর আন্তরিক উৎকণ্ঠার পরিচয় দেয়। শ্রীকান্ত পিয়ারীর অনুরোধ রক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয়—গৃহে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত। শ্মশান পরিক্রমার পরের দিন অজ্ঞাতসারে শ্রীকান্তর পথে বেরিয়ে পড়া, নিবিড় জঙ্গলে পথ ভুলে সঞ্চরণ, অন্ধকারের রূপ সম্পর্কে অবহিতি, এবং দেশে প্রত্যাবর্তন।

দোলপূর্ণিমার রাতে আবার অজ্ঞাতকারণে গৃহত্যাগ, বিবাগী-চিত্তে-পথপরিক্রমা, পাটনার সন্নিকটে বাড়-স্টেশনে ট্রেন থেকে বিনা-সিদ্ধান্তে উত্তরণ, সামনে পায়ে-চলা অজানা পথ। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে শ্রীকান্ত, বনের মধ্যে ধোঁয়া দেখে মানুষের সন্ধানে গিয়ে সাক্ষাৎ পান এক ভণ্ড সাধুর, সন্ন্যাসীর বেশ পরিধান ক'রে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ছোটবাঘিয়া গ্রামে গুরুজীসহ আবির্ভাব, সেখানে মহামারীরূপে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব, গুরুজীর পলায়ন, শ্রীকান্তর সঙ্গে রামবাবুর পরিবারের ঘনিষ্ঠতা, গ্রামত্যাগের আয়োজনে ব্যস্ত রামবাবুর পরিবার, শ্রীকান্তর জ্বর এবং তাকে ছেড়ে আতঙ্কিত রামবাবুর গ্রামত্যাগ। জ্বরাক্রান্ত শ্রীকান্তর এক অপরিচিত যুবকের সাহায্যে পাটনায় পিরায়ী বাইজীর কাছে সংবাদ প্রেরণ, পিয়ারীর সদলবলে আগমন ও শ্রীকান্তকে পাটনায় নিজগৃহে আনয়ন। পিয়ারী বাইজী বা রাজলক্ষ্মীর অকৃপণ সেবায় শ্রীকান্তর রোগমুক্তি। ক্লান্তদেহে রাজলক্ষ্মীর অনুধ্যান, প্রণয়ের পদসঞ্চার, রাজলক্ষ্মীর পালিতাপুত্র বঙ্কুর উপস্থিতিতে রাজলক্ষ্মীর মধ্যে প্রেমিকা-মূর্তির তুলনায় মাতৃমূর্তির প্রাধান্য। বঙ্কুর কারণে রোগমুক্ত শ্রীকান্তকে বিদায় দিতে রাজলক্ষ্মীর আগ্রহ। প্রেমিকার কাছে আত্মসমর্পণ করতে শ্রীকান্ত যখন মনে মনে প্রস্তুত, তখনই রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তর চ'লে যাওয়ার জন্য অধীর হ'য়ে উঠলো। শ্রীকান্তকে পাটনা থেকে বিদায় নিতে হ'লো, বুঝতে হ'লো যে, বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, দূরেও সরিয়ে দেয়।

Scanned with CamScanner